দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JAN 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

C44

দৈনিক ইনকিলাব

# পাঠ্যপুস্তক ও নোটবই : এই অনাচার বন্ধ হোক

সালাহউদ্দিন চৌধুরী

পাঠ্য পুস্তকের নোটবই ছাপানো ও বিক্রি করা নিষিদ্ধ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী পর্যন্ত। এক সময় নোটবই-এর ব্যবসা এমন জমজমাট হয়ে উঠেছিলো যে, পাঠ্যবই-এর চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নোটবই ক্রয় করাই বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো। বই-এর ব্যবসায়ীরাও নোটবই বিক্রির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন অত্যধিক। অবশ্য ব্যবসায়ীদের গুরুচ্চতব আরোপের পিছনে মোটা মুনাফা অর্জনের প্রবল প্রলোভনও বিশেষভাবে কাজ করেছে। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের বই নির্ধারিত দামে বিক্রি করতে হয় বলে পুস্তক ব্যবসায়ীরা মনে করে থাকেন, তারা যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করতে পারছেন না। কেউ কেউ তো এ কথাও বলে থাকেন, 'বোর্ড যে কমিশন দেয় তাতে আমাদের খরচই উঠে আসে না। নোটবই-ই আমাদের ভরসা।'

একশ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ীর এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে বই-এর ব্যবসা করতে বসে তারা বইকে মুদী দোকানের পণ্যের মতোই গণ্য করছেন, যেটা সম্পূর্ণরূপে অনভিপ্রেত।

এটা সকলেই জানেন যে, নোটবই-এর দাম রাখা হয় অত্যন্ত বেশী। মূল পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে প্রায় সাত-আটগুণ বেশী ধরা হয় নোটবই-এর দাম। সহজে কোনো রকমে পরীক্ষায় পাস করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরাও নোটবই-এর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু এই বহুমূল্য নোটবইগুলো কিনতে গিয়ে অভিভাবকরা যে কতোখানি আর্থিক চাপের সম্মুখীন হন তা প্রায় কেউই বুঝতে চান না। এমনকি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নোটবই-এর সাহায্য নিতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন বলে শোনা যায়। এক সময় এই সুযোগই পুস্তক ব্যবসায়ীরা পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। তারা এমন দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলেন যে, নোটবই ছাড়া পাঠ্যবই বিক্রি করাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যারা নোটবই কিনতে চাইতো না তাদেরও তাই বাধ্য হয়ে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে নোটবই কিনতে হতো। আর এই সুবাদে পুস্তক ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর মোটা মুনাফা বাগিয়ে ব্যাংক ব্যালেন্স স্ফীত করতেন।

যদি এসব নোটবই মানসম্পন্ন হতো তাহলেও একটা সান্ত্বনা ছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব নোটবই-এর অধিকাংশের প্রণেতা ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত। তাই লেখকের জায়গায় প্রায়ই ছাপা হতো, "অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক"। খোঁজ করলে হয়তো দেখা যেতো যে, কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদেরই এই নোটবইগুলো রচনার দায়িত্ব ছিলো না। যাকে-তাকে দিয়ে যা-তা কিছু লিখিয়ে অধিকাংশ নোটবই প্রকাশ করা হতো। আর ছাত্র-ছাত্রীরা সে সব নোটবই পড়েই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বনে যেতো বলে হয়তো পুস্তক ব্যবসায়ীরা মনে করতেন।

> নোটবই-এর লেখক হিসেবে নাম ছাপা হয় না_ কারো লেখা হয় 'অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রণীত'_ এসব নোটবই যারা লেখেন তাদের কেউ চেনে না, নাম জানে না_ পাঠ্য বই নিয়েও ঘাপলা কম নয়_ কর্তৃপক্ষের এদিকে নজর দেয়া উচিত।

এখানে আমি দু'টো দৃষ্টান্তের উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বছর পাঁচেক আগে আমারই এক বন্ধুকে দেখেছি, এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্যে ইতিহাসের নোট বই লিখতে। ওটা ছাপা হবে একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদের নামে। আমার বন্ধুটি ইতিহাস কেমন জানতেন তা আমার জানা ছিলো না। তবে আমি এটুকু জানতাম যে, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং তিন চারবারের চেষ্টায় কোনো রকমে পাস কোর্সে বিএসসি পাস করেছিলেন।

আর একটি সুযোগ আমি নিজেই পেয়েছিলাম। সাধারণ বিএ পাস এক ভদ্রলোকের মাধ্যমে ঢাকার এক বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা আমাকে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা সাহিত্যের নোটবই লেখার অফার দিয়েছিলেন। ঐ বিএ পাস ভদ্রলোক ইতিমধ্যে 'একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্তৃক প্রণীত'—এই নামে বেশ কয়েকটি বিষয়ের নোটবই লিখে উক্ত প্রকাশনা সংস্থার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। আমি কিন্তু ঐ সুযোগ গ্রহণ করতে পারিনি। সবিনয়েই অফারটি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।

যাই হোক, কর্তৃপক্ষ কয়েক বছর আগে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই ছাপানো ও বিক্রির করা নিষিদ্ধ করে দেন। এতে অনেকেই আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে নোটবই ছাপানো ও বিক্রি বন্ধ হলেও গোপনে যে এই অপকর্মটি অব্যাহত ছিলো তার পরিচয় পাওয়া যায় মফস্বল এলাকায় গেলেই।

পুস্তক ব্যবসায়ীরা বইয়ের ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করতে পারবেন না তেমন অর্বাচীন উক্তি আমি করতে চাই না। তারা ব্যবসা করতে এসেছেন কিছু লাভের আশা নিয়েই। কিন্তু বই আর মুদী দোকানের পণ্য যে, এক জিনিস নয়, সে আভাস আমি আগেই দিয়েছি। তাই তাদের ব্যবসা ও মুনাফা অর্জনের পরিমাণটি যুক্তিসঙ্গত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অন্যদিকে টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্যবই নিয়েও ঘাপলা কম নেই। বিনামূল্যে বিতরণের বই প্রায়ই প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রি করতে দেখা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিনামূল্যের বই না পেয়ে বাজার থেকে ঐ একই বই নগদ টাকায় কিনতে বাধ্য হয় এ খবর প্রতি বছরই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তাতে কোনো লাভ হয় বলে মনে হয় না। কর্তৃপক্ষ হয়তো বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট সংখ্যক বই ঠিকই পাঠান, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তা পৌঁছোয় না। এ সব বই নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীরা গোলমাল করেন, নয় তো স্কুলের কর্মচারীরাই গোলমাল করেন। আবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয় কর্মচারী ও স্কুলের কর্মচারীদের যোগসাজশেই গোলমাল হতে পারে।

ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের কথা আমি নিজেই জানি। সে স্কুলে বিনামূল্যের বই বিতরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা অহেতুক গড়িমসি করছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পরে ছাত্রীদের বিনা মূল্যের বই বিতরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা কেন এই গড়িমসি করছিলেন তার কারণ আপাতঃ দৃষ্টিতে রহস্যাবৃত মনে হলেও আমার ধারণা, এই গড়িমসির পিছনেও 'একটা গোলমাল' করার সুযোগ খোঁজা হচ্ছিলো। ব্যাপারটি যদি প্রধান শিক্ষিকার কর্ণগোচর না হতো তা হলে হয়তো 'গোলমালটা' বাস্তব রূপই লাভ করতো।

সম্প্রতি টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্যবই ও নোটবই অবৈধভাবে বিক্রি করার জন্য মজুত রাখার একটি ঘটনা ধরা পড়েছে ঢাকার সর্ববৃহৎ বইপাড়া বাংলাবাজারে। প্রায় ৬ লাখ টাকার পাঠ্যবই ও নোটবই উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট কোটার বাইরে অবৈধভাবে ছাপানো হয়েছিলো। এ ব্যাপারে ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সব ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, পাঠ্যবই ও নোটবই নিয়ে কি ধরনের কেলেংকারি চলছে দেশে। কর্তৃপক্ষ কি এ ব্যাপারে আরো সচেতন ও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবেন?